INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

সাংখ্য দর্শন সমীক্ষা

*** ড. অভিজিত মণ্ডল**

https://doi.org/10.5281/zenodo.21075820

সারসংক্ষেপ

ভারতীয় ষড়দর্শনের একটি আস্তিক দর্শন সম্প্রদায় হল সাংখ্য দর্শন। মহর্ষি কপিল সাংখ্য দর্শনের জনক হিসাবে পরিচিত। এই দর্শনকে সাংখ্য দর্শন বলার কারণ হল এই দর্শন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পঁচিশটি মূলনীতির বর্ণনা করে। 'সাংখ্য' কথাটি এসেছে সংস্কৃত 'সংখ্যা' শব্দ থেকে। তাই একে কখনও কখনও 'সংখ্যার দর্শন' বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এই কথাটির একটি অর্থ আছে। এর দ্বারা স্বাভাবিক ও আত্মিক প্রভেদের মতো বস্তুর যথার্থ প্রকৃতি ও আপাত প্রতীয়মান প্রকৃতির মধ্যে প্রভেদ বুঝিয়ে থাকে। আর এজন্য একে বলা হয় সাংখ্যদর্শন। আসলে সাংখ্যদর্শন বস্তুর যথার্থ প্রভেদ ও সঠিক জ্ঞান বর্ণনা করে। সাংখ্যদর্শন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পঁচিশটি মূলতত্ত্বের কথা বলে থাকে। আর যে পদ্ধতিতে আমরা এই সকল মূলতত্ত্ব ও তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারি এবং তাদেরকে বিশ্লেষণ করতে পারি, সেই বিষয়টি এই দর্শন বর্ণনা করে। আসলে এই দর্শন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বস্তুর বিবর্তন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। আবার এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত কারণ সন্ধান করার চেষ্টা করেছিল। যাইহোক আমি এখানে আমার এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে সাংখ্যদর্শন তত্ত্বের কিছু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

সূচক শব্দ- সাংখ্য, প্রকৃতি, পুরুষ, সৎকার্যবাদ, গুণ, ঈশ্বর।

**স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ, গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ*

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

ভারতীয় ষড়দর্শনের একটি আস্তিক দর্শন সম্প্রদায় হল সাংখ্য দর্শন। সাংখ্য দর্শনকে সর্ব প্রাচীন দর্শন বলে মনে করা হয়ে থাকে। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা এই দর্শনের আদি গ্রন্থরূপে বিবেচিত। সাংখ্য দর্শনে 'সাংখ্য' শব্দের অর্থ নিয়েও নানা মত রয়েছে। একটি মতে বলা হয়েছে 'সংখ্যা' শব্দ থেকে 'অন' প্রত্যয় যোগ করে 'সাংখ্য' শব্দটি নিস্পন্ন। অপর দিকে আরও একটি মত প্রচলিত আছে। সেই মত অনুসারে, 'সম' পূর্বক 'খ্যা' ধাতু থেকে 'সাংখ্য' শব্দটি নিস্পন্ন। আর এই 'সংখ্যা' শব্দ থেকেই 'সাংখ্য' শব্দের উৎপত্তি। 'সংখ্যা' শব্দের আভিধানিক অর্থ করা হয় গণনা। তাই শম্ভুনাথ চক্রবর্তীর মতে, "সাংখ্য বলতে পরিসংখ্যান বা গণনা। যে শাস্ত্রে পঁচিশটি তত্ত্বের গণনা ও আলোচনা করা হয়েছে, তাই সাংখ্য শাস্ত্র"।[১] মহর্ষি কপিলদেব সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা। সাংখ্য দর্শনে দুটি মূল তত্ত্বকে স্বীকার করা হয়। দুটি মূল তত্ত্ব হল পুরুষ এবং প্রকৃতি। আবার সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি তত্ত্ব সৎকার্যবাদের উপর নির্ভর। অর্থাৎ সাংখ্যের প্রকৃতিসিদ্ধি সৎকার্যবাদের উপরেই প্রতিষ্টিত হয়ে আছে।

সৎকার্যবাদ – সাংখ্য দর্শনের কার্যকারণতত্ত্ব সৎকার্যবাদ নামে অভিহিত হয়েছে। কার্যকারণতত্ত্ব অনুসারে কারণ ছাড়া কোনো কার্যই ঘটা সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন হল কার্য উৎপত্তি হওয়ার পূর্বে কি উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে? সাংখ্য মতে কার্যের মধ্যেই কারণ নিহিত আছে। আর সেজন্যই বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বভাব হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। আসলে সৎকার্যবাদ কথাটির অর্থ হল, যা কার্য অর্থাৎ উৎপন্ন হয় তা উৎপত্তির পূর্বে তার নিজের উপাদান কারণে সৎ; অর্থাৎ বিদ্যমান। কার্য ও কারণ দুটি ভিন্ন হলেও 'সৎ'। সাংখ্য মতে, কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে সেই কার্য উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে। তবে সেই কার্য অব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। যেমন-ঘট কার্য মৃত্তিকার মধ্যে অব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। আর কুম্ভকার দণ্ড চক্রের সহায়তায় মৃত্তিকা থেকে ঘটকে ব্যক্ত বা প্রকট করেন। সাংখ্য দার্শনিকের মতে 'সৎ' থেকেই 'সৎ'-এর উৎপত্তি হয়। আর 'অসৎ' থেকে 'সৎ'-এর উৎপত্তি কখনও সম্ভব নয়। সাংখ্য কারিকায় বলা হয়েছে, "উৎপত্তির পূর্বেও কার্য্য সৎ, কেন না কার্য্যটী অসৎ হইলে কেহ তাহাকে উৎপন্ন করিতে পারিত না। কার্য্য ও কারণের নিয়ত সম্বন্ধ থাকা চাই, নতুবা সকল বস্তুতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে, সৎ ও অসতের সম্বন্ধ হয় না অতএব কার্য্য সৎ"।[২] সৎকার্যবাদ অনুসারে কোনো পদার্থ, তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট বা উৎপত্তি হতে পারে না। কেননা একটি পদার্থ, তার থেকে ভিন্ন পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট বা উৎপত্তি হলে, যেকোনো পদার্থ, অন্য যেকোনো পদার্থের উৎপাদক হতে পারে। এর ফলে 'অমুক কারণ দ্বারা অমুক কার্য জন্মায়'- এই নিয়ম ব্যর্থ হয়ে যাবে। আবার সাংখ্য মতে সৎকার্যবাদের দুটি রূপ আছে। যথা- পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ। কার্যকারণতত্ত্বের পরিণামবাদ অনুসারে কারণ থেকে যখন কার্যের উৎপত্তি ঘটে, তখন কারণ প্রকৃতই কার্যে পরিণত হয়। এই মতানুসারে কার্যের মধ্যে এমন কিছু থাকতে পারে না, যা কারণের মধ্যে অবশ্যই বীজ আকারে বর্তমান নেই। যেমন- মৃত্তিকা থেকে যখন ঘটের উৎপত্তি হয় তখন মৃত্তিকা প্রকৃতই ঘটে পরিণত হয়। কেননা ঘট মৃত্তিকার যথার্থ পরিণাম। অর্থাৎ মৃত্তিকা কারণের মধ্যে ঘট কার্য অবশ্যই বীজ আকারে বর্তমান ছিল। আসলে "কার্যের মধ্যে যা বর্তমান কারণের মধ্যেও তার সত্তা অনুমেয়"।[৩] আর সাংখ্য দার্শন পরিণামবাদের সমর্থক। আপরদিকে বিবর্তবাদ অনুসারে কারণ বাস্তবিকই কার্যে পরিণত হয় না। এক্ষেত্রে কারণ কার্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। যেমন- রজ্জুতে সর্প ভ্রম। কেননা রজ্জু

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

প্রকৃতই সর্পে পরিনত হয় না। সর্পে রুপান্তরিত হয় না। দৃষ্টি ভ্রমের কারণে রজ্জু সর্পরূপে প্রতিভাত হয়। তাই রজ্জুর বিবর্ত রূপ হল সর্প। আর বির্বত হল প্রতিভাতরূপ। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন বিবর্তবাদের সমর্থক।

সাংখ্য মতে প্রকৃতি- সাংখ্য দর্শনের প্রথম এবং প্রধান মূল তত্ত্বটি হল প্রকৃতি। প্রকৃতি এই জড়জগতের মূল উপাদান কারণ। সাংখ্য দর্শনে উপাদান কারণেই প্রকৃত ও যথার্থ কারণ বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতি হল জগতের বীজ ও জগতের অব্যক্ত অবস্থা। প্রকৃতি হল বিশ্বের বা জগতের অমূল মূল। "দ্বৈতবাদী সাংখ্য মতে সমগ্র জড় প্রপঞ্চের যেটি অমুল মূলতত্ত্ব তারই নাম দেওয়া হয়েছে প্রকৃতি।"[৪] সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি তত্ত্বের কথা বা আলোচনা বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। ঐ প্রকৃতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জগত সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রকৃতির মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব বলে তার সম্পর্কে সচেতনতা বোঝা যায়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি জিনিস প্রকৃতি থেকে ক্রমিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে উৎপন্ন হয়। মহৎ বা বুদ্ধি থেকে আরম্ভ করে পঞ্চ মহাভুত পর্যন্ত সকল কার্যের মূলে রয়েছে প্রকৃতি। প্রকৃতি বিভু, পূর্ণ ও অসীম। প্রকৃতি বহু নয়, এক। প্রকৃতি চেতন নয়, জড়। প্রকৃতির আর একটি নাম হল অব্যক্ত। প্রকৃতি কখনও ব্যক্ত হয় না। কেননা প্রকৃতির কোনো কারণ থাকে না। প্রকৃতি নির্বিশেষ ও নিরবয়ব। তাই প্রকৃতি অতি সূক্ষ্ম এবং আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নয়। প্রকৃতির আদি বা অন্ত নেই। প্রকৃতি নিত্য এবং অবিনাশী। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। সাংখ্য দর্শনে গুণ বলতে উপাদানকে বোঝায়। এই দর্শনে বলা হয়েছে, "প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা- সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-এই তিনটি গুণের সাম্য অবস্থার নামক প্রকৃতি, তাই প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা"।[৫] সাংখ্য মতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতির ধর্ম নয়। তবে এগুলি প্রকৃতির স্বরূপ অর্থাৎ এগুলি প্রকৃতির উপাদান। যেমন একখণ্ড রজ্জু তিনটি তার বা গুণের দ্বারা নির্মিত হয়, সেইরূপ এই জগতের প্রতিটি বস্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি উপাদানের দ্বারা গঠিত হয়। এই জন্য এদের গুণ বলা হয়। গুণগুলি পুরুষের উদ্দেশ্যসাধন করে এবং পুরুষ বা আত্মাকে জগতের সঙ্গে বেঁধে রাখে। গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, কারণ এগুলি খুব সূক্ষ্ম। আবার এই তিনটি গুণের স্বভাব হল এরা নিয়ত পরিণামশীল। জগতের বিভিন্ন বস্তু এই সকল গুণগুলির কার্য এবং এই কার্য থেকে এদের অস্তিত্ব অনুমান করে নেওয়া হয়।

প্রকৃতির গুণত্রয়- প্রকৃতির উপাদান ত্রিবিধ- সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ । এগুলিকে পারিভাষিক অর্থে 'গুণ' বলা হয়। তবে চলতি কথায় আমরা গুণ বলতে যা বুঝি সাংখ্য দর্শন তা বোঝে না। সাংখ্যরা গুণ বলতে কি বুঝিয়েছেন? ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকায় গুণত্রয়ের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, "প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ"।[৬] সাংখ্য দর্শনে তিনটি গুণকে প্রীতি, অপ্রীতি ও বিষাদ বলা হয়েছে। প্রীতি সুখকে, অপ্রীতি দুঃখকে এবং বিষাদ মোহকে বোঝানো হয়। তাই সাংখ্য মতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্ব হল সুখদায়ক, রজঃ হল দুঃখদায়ক এবং তমঃ হল বিষাদাত্মক। তাঁদের মতে জগতের সকল বস্তুর মধ্যে যদি সুখ, দুঃখ ও বিষাদ-এই তিনটি উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় তাহলে জাগতিক বস্তু সকলের আদি বা কারণের মধ্যেও এই তিনটি উপাদান অবশ্যই থাকবে। সাংখ্য দার্শনিকরা এই তিনটি উপাদানকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামে অভিহিত করেন। তাঁদের মতে সুখের যাবতীয় অবস্থা আনন্দ, প্রীতি, সন্তোষ, উল্লাস ইত্যাদি সত্ত্বগুণের জন্য বস্তুতে উপস্থিত থাকে। রজঃ গুণের স্বভাব হল প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া। রজঃ হল গতিশীল ও উত্তেজক। রজঃ গুণ দুঃখস্বরূপ এবং সকল রকম দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কারণ। তমঃ গুণ

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

বস্তুর নিষ্ক্রিয়তা ও অসারতার কারণ। জীবের মধ্যে ভ্রম, প্রমাদ, নিদ্রা, আলস্য, তন্দ্রালুতা তমঃ গুণের উপস্থিতির জন্য উৎপন্ন হয়। তমঃ গুণের জন্য মনে নিস্পৃহতা বা বিষাদের সৃষ্টি হয়। তবে একটা প্রশ্ন হতে পারে এই গুণগুলিকে বস্তুতে এক সঙ্গে থাকতে পারে? সাংখ্য মতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ সব সময় একত্রে ক্রিয়া করে এবং এদের কোনো ভাবে পৃথক করা যায় না। জগতে এমন কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নেই যার মধ্যে এই তিনটি গুণ কোন না কোন পরিমাণে উপস্থিত নেই। তবে গুণগুলির তারতম্যের জন্য জগতে এত বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

সাংখ্য মতে পুরুষ– দ্বৈতবাদী সাংখ্য দর্শনের দুটি মূল তত্ত্বের মধ্যে দ্বিতীয় মৌলিকতত্ত্ব হল পুরুষ। "সাংখ্যের তত্ত্ব পরিসংখ্যানের পঁচিশতম তত্ত্বরূপে 'পুরুষ' গণ্য"।[৭] সাংখ্য দর্শনে আত্মা পুরুষ নামে অভিহিত হয়। কারন ভারতীয় দর্শনে আত্মা ও পুরুষকে অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। তবে আত্মার স্বরুপ সম্পর্কে অভিন্ন মত প্রকাশ হয়নি। সাংখ্য মতে পুরুষ বা আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি থেকে ভিন্ন। তাঁদের মতে, পুরুষ বা আত্মা দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বা জড়জগতের স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ। পুরুষ কোন বস্তু নয়। আবার চৈতন্যগুণবিশিষ্ট দ্রব্য নয়। "কারণ চৈতন্য বা জ্ঞান পুরুষের ধর্ম গুণ নয়। কারন চৈতন্যকে পুরুষের ধর্ম বললে পুরুষকে বিষয় বলতে হবে। সেটি সাংখ্য সিদ্ধান্ত বিরোধী"।[৮] তাই চেতন বলতে চৈতন্য স্বভাব বুঝতে হবে। কেননা পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ। আর চৈতন্য স্বরুও হওয়ার কারনে পরুষ চেতন। পুরুষ জড়ের প্রকাশক অর্থাৎ নিস্ক্রিয়। পুরুষ নিত্য। পুরুষ কুটস্থ নির্বিকার। পুরুষ নির্গুণ। পুরুষের সুখদুঃখ নেই। তাই পুরুষ উদাসীন। পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব। সাংখ্য মতে, পুরুষ নিস্ক্রিয়, উদাসীন ও অকর্তা বলে জগত সৃষ্টিতে পুরুষের ভূমিকা তেমনভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়। পুরুষ অপরিণামী। তাই সৃষ্টি পদার্থে পুরুষের কোনো উপস্থিতি থাকে না। পুরুষ প্রাকৃতিক বিকারের অতীত। সাংখ্য মতে পুরুষ এক নয়, বহু। কারণ সাংখ্য মতে পুরুষ বা আত্মা বহু না হয়ে এক হলে একজনের জন্ম হলে সকলের জন্ম হত। অথবা একজনের মৃত্যু হলে সকলের মৃত্যু হত। আবার একজন ব্যক্তি কোন কার্যে প্রবৃত্ত হলে অন্য সকল ব্যক্তি সেই কার্যে প্রবৃত্ত হত। কিন্তু বাস্তবে এমনটা কখনও হয় না বা দেখা যায় না। তাই পুরুষ বা আত্মা এক নয়, বহু। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, সাংখ্য দর্শনে ব্যবহারিক পুরুষ এবং পারমার্থিক পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। এই পার্থক্যে বলা হয়েছে 'ব্যবহারিক' পুরুষকে 'জীব' এবং 'পারমার্থিক' পুরুষকে 'পুরুষ' নামে অভিহিত করা হয়। পুরুষ কর্তা নয়, ভোক্তা নয়। জীব হল কর্তা এবং ভোক্তা। পুরুষই অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হওয়াতে জীব নামে অভিহিত হয়। সাংখ্য দর্শনে মন, বুদ্ধি এবং অহংকারকে অন্তঃকরণ বলা হয়।

জগৎ সৃষ্টি বা অভিব্যক্তির পরিচয়- প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগের মাধ্যমেই জগতের অভিব্যক্তি শুরু হয়। আসলে প্রকৃতি পুরুষের আত্মিক আলোকে আলোকিত হওয়া মাত্রই সে আত্মচৈতন্য লাভ করে, আর তখনই আরম্ভ হয় অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ। জগত সৃষ্টির ক্ষেত্রে "প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ভঙ্গ এবং পুনরায় সাম্যবস্থাতে প্রত্যাবর্তন পুরুষের সান্নিধ্য ও অসান্নিধ্য ছাড়া ব্যখ্যা করা যায় না"।[৯] সক্রিয় প্রকৃতির সঙ্গে চেতন পুরুষের সংযোগ না ঘটলে জগতের অভিব্যক্তি সম্ভব হয় না। কিন্তু বিরুদ্ধধর্মী পুরুষ ও প্রকৃতি সংযোগ কিভাবে সম্ভব? দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন পঙ্গু যেমন চলন শক্তিসম্পন্ন অন্ধকে কাঁধে করে উভয়ে মিলে জটিল দুর্গম জনপথ থেকে সত্য সরল রাজপথে উপস্থিত হতে পারে। সেরূপ নিষ্ক্রিয় চেতন পুরুষ এবং সক্রিয়

অচেতন প্রকৃতি উভয়ে মিলিত হয়ে চেতন সত্তার মতো কার্য করে থাকে। অর্থাৎ জগতের অভিব্যক্তিকে সম্ভব করে তোলে। প্রকৃতির পরিণামের দুটি প্রয়োজন। প্রথমতঃ পুরুষের ভোগ এবং দ্বিতীয়তঃ মুক্তির প্রয়োজনে প্রকৃতির বিরূপ পরিণাম। প্রকৃতির জন্যই পুরুষের বন্ধন। প্রকৃতির সঙ্গে অভেদ অবস্থায় থাকার কারণে পুরুষের মধ্যে বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সুখ দুঃখের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত পুরুষের সুখ দুঃখের প্রতিবিম্বত অবস্থার নাম হল ভোগ। ভোক্তা না থাকলে ভোগ নিরর্থক। অতএব ভোক্তারা অপেক্ষা করে আছে ভোগ্য বস্তুতে। সুখ দুঃখ রূপে ভোগের মধ্যে দুঃখের তাপ সুখের ছায়া থেকেও অধিক। এই বোধ যখন পুরুষে জাগ্রত হয়, তখনই হয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। মুক্তির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত আছে পুরুষ প্রকৃতির ভিন্নতার তত্ত্ব নিরূপণ। বুদ্ধি বৃত্তিই পুরুষ প্রকৃতির ভিন্নতার সাক্ষাৎকার ঘটায়। বুদ্ধি না হলে ভোগ হয় না। প্রকৃতি না থাকলে বুদ্ধিও হয় না। তাহলে প্রকৃতির অপেক্ষা পুরুষের আছে। পারস্পরিক এই অপেক্ষার জন্যই প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ।

সাংখ্য মতে, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা হল প্রকৃতি। সাংখ্য মতে, পুরুষ ও প্রকৃতি সংযোগর ফলে গুণক্ষোভ ঘটে এবং সাম্যাবস্থা ব্যাহত হয়। "চেতন পুরুষের সান্নিধি বশত অচেতন প্রকৃতিতে যে বিক্ষোভ শুরু হয় তারই প্রতিক্রিয়ায় সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব বা অভিব্যক্তিবাদের সুচনা"।[১০] প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের ফলে মহাদাদি যে তেইশটি পদার্থের আর্বিভাব হয়। এই সকল পদার্থ একই সময় প্রকৃতি থেকে আর্বিভাব বা সৃষ্টি হয় না। তাহলে কিভাবে সৃষ্টি শুরু হয়? প্রকৃতি থেকে সকল পদার্থ আর্বিভাব বা সৃষ্টি হয় ক্রমানুসারে। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম হল মহৎতত্ত্ব বা বুদ্ধি। এই বুদ্ধিকে বলা হয় মহান। কারণ এই জগতের যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টির বীজ 'মহৎ' বা বুদ্ধির মধ্যে রয়েছে। আবার জীবের মধ্যে বুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয় বলে মহৎকে 'বুদ্ধি' বলা হয়। আর এই বুদ্ধির জন্যই সকল জীবের মধ্যে বুদ্ধি দেখা যায়। বুদ্ধি চেতন পুরুষ থেকে ভিন্ন, কিন্তু চেতন পুরুষের সান্নিধ্য হেতু পুরুষের চৈতন্য বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয়। বুদ্ধির জন্যই প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদাভেদ সম্ভব হয়। প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম 'অহংকার'। এটি মহৎ থেকে উৎপন্ন হয়। অহংকারের জন্য পুরুষ নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা মনে করে। ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে অভিমান বা মমত্ববুদ্ধি অহংকারের লক্ষণ। অহংকারের বিকারের ফলে একদিকে একাদশ ইন্দ্রিয়ের তথা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক, অপরদিকে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় বাক, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং অন্তরইন্দ্রিয় মন আবির্ভাব হয়। আবার অপর দিকে পঞ্চতন্মাত্রের আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ অহংকারের দুটি ফল- একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র। অহংকারতত্ত্বে তমঃ গুণ প্রবল হতে তন্মাত্রের আবির্ভাব ঘটে। এই তন্মাত্র পাঁচ প্রকার। যথা- শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, ও গন্ধতন্মাত্র। আবার পঞ্চতন্মাত্র যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতি সৃষ্টি করে থাকে। এই তেইশটি পদার্থ হল মূল কারণ প্রকৃতি তথা গুণসমূহের পারস্পারিক সহযোগিতায় অভিব্যক্তি হয়ে থাকে। তবে এই অভিব্যক্তি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। কারণ এটি অতীতে ছিল বর্তমানে আছে ভবিষ্যতে থাকবে। কেবলমাত্র গুণত্রয়ের স্বাভাবিক বিসদৃশ বৈষম্যই হল এর কারণ। যেহেতু সাংখ্যের প্রকৃতি চব্বিশটি পদার্থ ছিল-আছে-থাকবে। তাই সাংখ্যের যাবতীয় পদার্থ হল সৎ। তাহলে সাংখ্যের পরিণামবাদে চব্বিশটিতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এই চব্বিশটিতত্ত্ব হল প্রকৃতি, পঞ্চ মহাভূত, ত্রয়োদশকরণ এবং পঞ্চ তন্মাত্র। এখানে পঞ্চ জ্ঞানইন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মইন্দ্রিয় মন এবং পঞ্চ

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

মহাভূত- এই ষোলোটি তত্ত্ব কারণ নয়, এগুলি কেবল কার্য। তাই এগুলিকে বলা হয় 'বিকৃতি'। আর মহৎ বা বুদ্ধি, অহঙ্কর এবং পঞ্চতন্মাত্র- এই সাতটি তত্ত্ব কারণ ও কার্য উভয় হতে পারে। তাই এগুলিকে 'প্রকৃতি বিকৃতি' দুই বলা হয়। মহৎ থেকে আরম্ভ করে স্থুল জাগতিক বস্তুসমুহ প্রকৃতিরই কার্য। প্রকৃতি জড়, অচেতন ও অবিবেকী হলেও প্রকৃতির পরিণাম উদ্দেশ্যমূলক। সাংখ্য মতে সৃষ্টি কার্যের পিছনে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে পুরুষের কোনো ভূমিকা বা ক্রিয়া থাকে না।

তাহলে প্রশ্ন পুরুষকে এখানে তত্ত্বরূপে গণ্য করা হয় কেন? বা জগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুরুষের কি কোনো ভূমিকা নেই? এর উত্তরে বলা যায়, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ সম্পূর্ণ প্রকৃতির সাম্যবস্থায় যখন থাকে তখন তার পরিণাম হয়। কিন্তু সৃষ্টি হয় না। কারণ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় গুণত্রয়ের বৈসাম্যাবস্থা অঙ্গাঙ্গিভাব। সাংখ্য মতে পুরুষে কোন কার্যের মধ্যে অনুবৃত্ত হয় না। অথবা তার অভাবে সকল কার্যের মধ্যে থাকে। সেইজন্য পুরুষ যথার্থ কারণ নয়। কেননা প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ভঙ্গ এবং পুনরায় সাম্যাবস্থাতে প্রত্যাবর্তন পুরুষের সান্নিধ্য বা অসান্নিধ্য ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না।

সাংখ্য মতে প্রমাণ- সাংখ্য দর্শন মতে প্রমাণ তিন প্রকার। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। সাংখ্য দর্শনে উপমান, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধিকে অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করার প্রয়োজন অনুভাব করেন না। কেননা এই প্রমাণ হয় প্রত্যক্ষ কিংবা শব্দ কিংবা অনুমানের অন্তর্ভুক্ত। সাংখ্য দার্শনিকরা জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করেন অর্থাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথার্থ্য জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত, অন্য কোন শর্তের উপর নির্ভর নয়। ঈশ্বর কৃষ্ণ প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, "প্রতিবিষয়াধ্যাবসায়োদৃষ্টং"।[১১] প্রতি বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের ফলে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে বুদ্ধির যে পরিণাম হয় তাকেই দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। যারা আযোগী তাদের পৃথিবী প্রভৃতি বাহ্য বিষয় এবং সুখাদি আন্তর বিষয় প্রত্যক্ষের বিষয়। আবার পঞ্চতন্মাত্রাদই যোগীদের প্রত্যক্ষের বিষয়। সাংখ্য দর্শন অনুমানের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, "তদলিঙ্গলিঙ্গিপূর্বক"।[১২] লিঙ্গ শব্দের অর্থ ব্যাপ্য বা হেতু। লিঙ্গি শব্দের অর্থ ব্যাপক বা সাধ্য। ধুম বহ্নির লিঙ্গ এবং বহ্নি ধূমের লিঙ্গি। এইরূপ লিঙ্গ লিঙ্গি বা ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ পূর্বক প্রমাকরণ হল অনুমান। সাংখ্য মতে তৃতীয় প্রকার প্রমাণ হল শব্দ। ঈশ্বর কৃষ্ণ শব্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "আপ্তশ্রুতিঃ আপ্তবচনং তু"।[১৩] আপ্তবাক্য হল বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপদেশ। যে ব্যক্তি ভ্রম বিপ্রলিপ্সাদি দোষমুক্ত তিনিই আপ্ত। এইরূপ আপ্তব্যক্তির উপদেশ হল শব্দ।

সাংখ্য নীতিতত্ত্ব - সাংখ্য দার্শনিকদের মতে এই জগৎ এবং জীবন দুঃখময়। তাই সাংখ্য দর্শনকে দুঃখবাদীও বলা হয়। তবে জগতে আনন্দ নেই একথা বলা যায় না। সুখ ও আনন্দ সবই আছে, কিন্তু তা অস্থায়ী। জাগতিক জীবনে যে সকল দুঃখ অহরহ আমাদের পীড়ন করে সেই সকল দুঃখকে সাংখ্য দর্শন তিন ভাগে বিভক্ত করেছে। যথা - আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। ঈশ্বর থেকে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। এবিষয়ে সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে ব্যাধি, আঘাত প্রভৃতি শারীরিক দুঃখ, এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য প্রভৃতি মানসিক দুঃখ হল আধ্যাত্মিক। সাংখ্য মতে, "আন্তর উপায়ের দ্বারা উৎপন্ন হয় বলে শরীর ও মানস দুঃখতে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে"।[১৪] শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ভিতর থেকে উৎপন্ন হয়। আর আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ বাহ্য কারণের দ্বারা নিস্পন্ন হয়। জীব অর্থাৎ পশু-পাখি হত্যা, সর্পাঘাত প্রভৃতির ফলে যে দুঃখ অনুভাব হয় তা আধিভৌতিক দুঃখ। আর ভূত, প্রেত, রাক্ষস প্রভৃতি অশুভ শক্তির কারণ থেকে

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

যে সকল দুঃখের উদ্ভব হয় তাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে। আসলে "প্রকৃতির দুর্যোগ যেমন, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প ইত্যাদির কারণে আমরা যে সকল দুঃখ ভোগ করি সে সকল দুঃখই আধিভৌতিক দুঃখ"।[১৫] অধিদৈবিক ও আধি ভৌতিক দুঃখের সাধারণ কারণ হল অদৃষ্ট। এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল মোক্ষ। দুঃখ নিবৃত্তির পক্ষে লৌকিক বা বৈদিক কোনো উপায় পর্যাপ্ত নয়। দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের উপায় তত্ত্বজ্ঞান। প্রকৃতি পুরুষের ভেদ জ্ঞান হল তত্ত্বজ্ঞান। সাংখ্য মতে, পুরুষ বা আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপ। পুরুষ দেহ, মন, অহংকার ও বুদ্ধি কোনটির সঙ্গে অভিন্ন নয়। পুরুষ এগুলির অতিরিক্ত ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক সত্তা। পুরুষ সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, মোহশূন্য। সুখ, দুঃখ, ধর্ম, অধর্ম সবই অন্তঃকরণের ধর্ম। অবিদ্যার কারণে পুরুষ অন্তঃকরণের ধর্মকে নিজের ধর্ম বলে মনে করে। পুরুষ বুদ্ধির ক্রিয়াকে নিজের ক্রিয়া বলে ধারণা করে। আবার নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা মনে করে। আসলে পুরুষ দেহ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে। অর্থাৎ পুরুষ নিজেকে কতৃত্বাভিমান বলে মনে করে। তবে এই আগন্তুক অভিমান ধর্ম অবিবেক প্রসূত। আর এই অভিন্ন মনে করাই হল পুরুষের বন্ধন। সুতরাং পুরুষ ও প্রকৃতির অবিবেক অর্থাৎ অভেদ জ্ঞান হল পুরুষের বন্ধনের কারণ।

মোক্ষ প্রসঙ্গে সাংখ্য মত – সাংখ্য দর্শন বিশ্বের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, এই জগতে যাকিছু আছে তারা প্রত্যকেই কোন না কোন প্রকার দুঃখকষ্ট সৃষ্টি করে। তবে তাঁদের মতে, বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান হল দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। "পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদাজ্ঞানকে বিবেকজ্ঞান বলা হয় এবং এই বিবেকজ্ঞানকে সাংখ্য দর্শনে মুক্তির কারণ বলা হয়েছে"।[১৬] সাংখ্য মতে, বিবেক জ্ঞানের দ্বারা ক্ষুদ্রতম ভেদ গঠিত হয়। তত্ত্বাভ্যাসের মাধ্যমে জীবের মধ্যে বিবেকজ্ঞান লব্ধ হয়। পুরুষ এবং প্রকৃতির ভেদজ্ঞানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হল তত্ত্বজ্ঞান। আবার আত্মা যে দেহ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত সত্তা এবং এদের সঙ্গে আত্মা কোনোভাবে অভিন্ন নয়, এর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। সাংখ্য মতে ধ্যান, ধারণা, অভ্যাস, বৈরাগ্য প্রভৃতির সহায়তায়, অর্থাৎ দীর্ঘ ও সুকঠিন যোগসাধনার মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব। তাঁদের মতে যাবতীয় দুঃখের আন্ত্যন্তিক নিবৃত্তি হল মুক্তি বা পুরুষার্থ। সাংখ্য মতে দুঃখের উৎপত্তি বন্ধ করা দুঃসাধ্য। তাছাড়া ধ্বংস প্রাপ্ত বস্তুরও পুনরায় আর্বিভাব হতে পারে। তাই লৌকিক উপায়ে দুঃখের সাময়িক বিনাশ হলেও আত্যান্তিক বিনাশ সম্ভব নয়। পুরুষ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হল মোক্ষ। এই অবস্থায় পুরুষের সুখ-দুঃখ, কর্তৃত্ব, ভোক্তত্ব সবই তিরোহিত হয়। সাংখ্য মতে মুক্তি দুই প্রকার। যথা - জীবন্মক্তি এবং বিদেহমুক্তি। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে জীব মোক্ষ লাভ করে। তখন জীবকে দুঃখ আর স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু তখন পর্যন্ত শরীর ধারণ চলতে থাকে। এককথায় "দেহের বর্তমানে বন্ধনের মূলোচ্ছেদ হলে জীবের যে মুক্তিলাভ হয়, তাই জীবন্মক্তি"।[১৭] জীবের মুক্তিতে জীবের সুক্ষ্ম সংসার থাকে। আর দেহের বিনাশে এই সংস্কার বিনাশ হয়। তাই সকল প্রকার সংস্কার মুক্ত পুরুষের স্বরূপের অবস্থানই বিদেহ মুক্তি বা পরম কৈবাল্য অবস্থা। আসলে মৃত্যুর পর জীবন্মুক্ত বিদেহমুক্তি লাভ করে। এই অবস্থায় স্থূল ও শরীর উভয়বিধ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে এবং প্রকৃতির নিবৃত্তি হেতু পুরুষ আত্যন্তিক এবং ঐকান্তিক এই দুই প্রকার কৈবল্য লাভ করে। একে বলা হয় বিদেহ মুক্তি বা কৈবল্য।

ঈশ্বর প্রসঙ্গে সাংখ্য মত – মহর্ষি কপিল প্রবর্তিত সাংখ্য দর্শনকে নিরীশ্বরবাদী বলা হয়।

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

কারণ সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। কারণ সাংখ্য দর্শন কোন ঈশ্বর কিংবা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে না। আসলে সাংখ্য দর্শনে বস্তুবাদী ভাবনায় জগতের সত্তা ও জগতের বাস্তবতা স্বীকৃত হয়। এই দর্শনে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তারূপে ঈশ্বর স্বীকৃত হয়নি। সাংখ্য দর্শন স্বীকার করে যে, জগৎ কেউ সৃষ্টি করেনি। তাই প্রাচীন সাংখ্য দার্শনিকরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। তারা যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন, (ক) এই জগৎ হল কার্য, তাই তার একটা কারণ থাকা অবশ্যক। কিন্তু ঈশ্বর নিত্য, অপরিণামী, শুদ্ধ চেতন সত্তা। তাই ঈশ্বর জগতের কারণ নয়। কেননা পরিণামী প্রকৃতি হল জগতের মূল কারণ। (খ) প্রকৃতির পরিচালক হিসাবে কোন সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারন ঈশ্বরের কর্ম প্রবৃত্তির কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। স্বার্থ ও করুণা, কোনটি ঈশ্বরের কর্ম প্রবৃত্তির কারণ হতে পারে না। কেননা জীবের প্রতি করুণা বশত ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করতে পারে না। জগত সৃষ্টির পূর্বে জীবের প্রতি করুণার কোন প্রশ্ন ওঠে না। (গ) জীবের স্বাধীন সত্তা বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে না। জগৎ সৃষ্টির মাধ্যমে ঈশ্বরের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ বা উদ্দেশ্য সাধন হতে পারে না। ঈশ্বর হল পূর্ণ সত্তা। তাই ঈশ্বরের কোন অপূর্ণ উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। সুতরাং জীবের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জগত সৃষ্টির প্রতি ঈশ্বরের প্রবৃত্তির নিয়ামক হতে পারে না। (ঘ) ঈশ্বর অসিদ্ধ। কারণ ঈশ্বর হয় বদ্ধ পুরুষ কিংবা মুক্ত পুরুষ, এক আদি পুরুষ কিন্তু ঈশ্বর এই দুটির কোনটিই নয়। (ঙ) কর্ম ফলের সিদ্ধিদাতারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। কারণ কর্ম স্বাভাবিকভাবে ফল প্রদান করে। ভাষ্যকার বাচস্পতি মিশ্র ও অনিরুদ্ধের মতে কপিলের সাংখ্য দর্শন নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু বিজ্ঞান ভিক্ষুর ও কোনো কোনো আধুনিক ব্যাখ্যাকারের মতে সাংখ্য দর্শন নিরীশ্বরবাদী নয়। এখন প্রশ্ন ওঠে কেন নিরীশ্বরবাদী নয়? বিজ্ঞান ভিক্ষুর ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও, ঈশ্বরকে এক আদি পুরুষরূপে গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বর হল নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। আর এর ফলে জগৎ সৃষ্টি হয়। আসলে বিজ্ঞান ভিক্ষুর বলেছেন, "জগৎ স্রষ্টা রূপে ঈশ্বর অসিদ্ধ এবং ঈশ্বর অসিদ্ধ কথা দুটি সমার্থক নয়"।[১৮] তারমানে সাংখ্য দর্শনে জগৎ স্রষ্টারূপে ঈশ্বর 'অসিদ্ধ' এই কথাটি স্বীকার করেন। কিন্তু 'ঈশ্বর অসিদ্ধ' এই কথাটি অস্বীকার করেন। প্রকৃতপক্ষে সাংখ্য দর্শন ঈশ্বরকে অসিদ্ধ বলেননি। তবে জগৎ কর্তা রূপে ঈশ্বরকে অসিদ্ধ বলেছেন। এখানে সাংখ্য মতে প্রকৃতি ও পুরুষের দ্বারা যখন জগতের উৎপত্তি ব্যখ্যা করা হয় তখন জগৎ স্রষ্টা রূপে ঈশ্বর স্বীকৃত আবশ্যক নয়। আর এমন কথা বললে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় না। সাংখ্য দর্শন তাই সেশ্বর, নিরীশ্বরবাদী নয়- এটাই হল বিজ্ঞান ভিক্ষুর মত। আসলে জগৎ সৃষ্টি ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা এখানে বলতে পারি, বিজ্ঞান ভিক্ষুর সুকৌশলে ব্যাখ্যার বলে ঈশ্বর প্রত্যখ্যানের বিষয়টি অগ্রাহ্য করেছেন। তবে তাঁর যুক্তি অস্পষ্ট। কারণ প্রাচীন গ্রন্থে ঈশ্বর প্রত্যখ্যানের যুক্তি সুস্পষ্ট এবং সাংখ্য দর্শনের সঙ্গে ঈশ্বর সংযোগের উৎসাহ নেহাত অবান্তর।

পরিশেষে সাংখ্য দর্শন সমীক্ষা থেকে আমরা বলতে পারি, সাংখ্য দর্শন হল দ্বৈতবাদী। কারণ এই দর্শন মূলত পুরুষ ও প্রকৃতি তত্ত্ব নিরূপণে আগ্রহী। তবে প্রকৃতি ও পুরুষ ছাড়া আরও তেইশটি তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এগুলি সবই প্রকৃতির পরিণামমাত্র। যাইহোক এই দর্শন মোট পঁচিশটি তত্ত্ব স্বীকার করে। এককথায় বলা যায় এই দর্শন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পঁচিশটি নীতির বর্ণনা করে। সাংখ্য মতে নিষ্ক্রিয় সচেতন পুরুষ ও সক্রিয় অচেতন প্রকৃতির সংযোগে জগৎ সৃষ্টি হয়। জগৎ প্রকৃতপক্ষে

প্রকৃতির পরিণাম। আর এই পরিণামের মূল কারণ বা বীজ হল প্রকৃতি এবং পুরুষকে নিমিত্ত কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। সাংখ্য মতে পুরুষ সংখ্যায় বহু। আবার জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে ঈশ্বরের কোনো ভূমিকা নেই। তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের কোনো প্রয়োজন নেই। আসলে সাংখ্য দর্শন কোন সৃষ্টি কর্তার বিশ্বাস করে না। তাই এই দর্শন পুরুষকে অবিনশ্বর ও সর্বজ্ঞ জ্যোতির্ময় মূল উপাদান হিসাবে মেনে নিয়েছে। তবে সাংখ্য দর্শনে বর্ণিত পুরুষই যোগ দর্শনে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর হিসাবে পরিচিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. চক্রবর্তী, শ। (২০২০)। *সমগ্র সাংখ্য সমীক্ষা প্রাচীনতা আধুনিকতা ও উপযোগিতা।* কোলকাতাঃ অভিযান, পৃঃ-১৩।

২. শ্রী পূর্নচন্দ্র বেদান্তচূঞ্চু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য্য সঙ্কলিত। (২০০৭)। *সাংখ্যকারিকা।* কোলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃঃ-৭১।

৩. চট্টোপাধ্যায়, দে। (২০১২)। *ভারতীয় দর্শন।* কোলকাতাঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, পৃঃ-১৫।

৪. ঘটক, প। (২০২১)। *সাংখ্য দর্শন -১।* কোলকাতাঃ প্রগ্রেসিভ, পৃঃ-৪৮।

৫. চক্রবর্তী, শ। (২০২০)। *সমগ্র সাংখ্য সমীক্ষা প্রাচীনতা আধুনিকতা ও উপযোগিতা।* কোলকাতাঃ অভিযান, পৃঃ-১৪।

৬. শ্রী পূর্নচন্দ্র বেদান্তচূঞ্চু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য্য সঙ্কলিত। (২০০৭)। *সাংখ্যকারিকা।* কোলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃঃ-৯৯।

৭. চক্রবর্তী, শ। (২০২০)। *সমগ্র সাংখ্য সমীক্ষা প্রাচীনতা আধুনিকতা ও উপযোগিতা।* কোলকাতাঃ অভিযান, পৃঃ-১৮।

৮. তদেব।

৯. চক্রবর্তী, ত। (২০১২)। *দর্শন-সমীক্ষা।* কোলকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃঃ-১৪।

১০. চক্রবর্তী, শ। (২০২০)। *সমগ্র সাংখ্য সমীক্ষা প্রাচীনতা আধুনিকতা ও উপযোগিতা।* কোলকাতাঃ অভিযান, পৃঃ-১৮।

১১. শ্রী পূর্নচন্দ্র বেদান্তচূঞ্চু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য্য সঙ্কলিত। (২০০৭)। *সাংখ্যকারিকা।* কোলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃঃ-২৯।

১২. তদেব।

১৩. তদেব।

১৪. দাশগুপ্ত, স। (২০২২)। *সাংখ্যদর্শনের মুলসমস্যা।* কোলকাতাঃ মহাবোধি, পৃঃ-৪।

১৫. তদেব, পৃঃ-৫।

১৬. চক্রবর্তী, ত। (২০১২)। *দর্শন-সমীক্ষা।* কোলকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পৃঃ-১৫।

১৭. মণ্ডল, প্র। (২০২১)। *ভারতীয় দর্শন।* কোলকাতাঃ প্রগ্রেসিভ, পৃঃ-২৪৮-২৪৯।

১৮. চক্রবর্তী, শ। (২০২০)। *সমগ্র সাংখ্য সমীক্ষা প্রাচীনতা আধুনিকতা ও উপযোগিতা।* কোলকাতাঃ অভিযান, পৃঃ-২৯৩।